রক্ষকই ভক্ষক

১৬.১২.১৯৬৫ — গাড়োয়ান

এভাবটা প শুদের মধ্যেই কিছুটা দেখা যায়। বেড়াল বা কুকুরকে তার গর্ভজাত সন্তানকে ভক্ষণ করতে দেখা গেছে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও এ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আরও একরকম আছে যাদের গা' চুলকোতে চুলকোতে যদি রক্ত বের হয়, আর সে রক্তের স্বাদ যদি জিহ্বা পায়, তবে সে অঙ্গকেই খেতে শুরু করে দেয়। এদিকে ব্যথায় অস্থির, কিন্তু মাংসের লোভও ত্যাগ করতে পারছে না— শেষ বেলায় অঙ্গহীন; আজ যেমন ভারতের অঙ্গহানি ঘটেছে।—এর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এই অঙ্গহানির মধ্যে পুরোপুরি হিংস্র স্বভাবের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। নিজের মাংসকে নিজে খেয়ে কত বড় ক্ষতি করেছে, যার ফল এখনও আমরা ভোগ করছি। হিংস্রতা ও লালসাসম্পন্ন প্রাণীদের সংগঠন অতি ক্ষতিকারক ও ভয়ঙ্কর। এই হিংস্র জাতি বনে থাকে-একথাই পড়ে ও শুনে এসেছি। আজ দেখছি সে পড়া ভুল, সেই শোনা মিথ্যা, এখন তারা এসে আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে।— তাদের থেকে দেশবাসী কি আশা করতে পারে! খাওয়া পেত না, পরা পেত না, বনে জঙ্গলে ফেউ ফেউ করে ঘুরত—এখন হঠাৎ খাবারের থালার সামনে এসে পড়েছে—আর কি নড়ে? আশে পাশে কি হ'ল দেখবারও সময় নেই। 'তোরা থাক বা মর আমারটা আমি আগে সেরেনি।' খা তো খা, ক্ষতি নেই। খেয়ে আবার সেই পাতেই বিষ্ঠা ত্যাগ করল, অপরে এসে যাতে ভাগ বসাতে না পারে। কোনটার মধ্যেই তারা নেই, যাদের কাজ শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, তারা বসে গেছে পানের দোকান, বিড়ির দোকান নিয়ে— তাদের থেকে আমরা কি আশা করতে পারি? জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত সুযোগ দেওয়াই হ'ল শাসন ও রক্ষাকর্তাদের কর্তব্য। তারা তাদের বঞ্চিত করে নিয়ে এল নিজেদের হাতে—কি জানি তারা যদি দুটো মুঠো বেশী পেয়ে যায়! সেটা আমাদের মুখেই এসে পড়ুক। মুখের গর্ত্তে ঢালতে ঢালতে গর্ত ভরা এখনও শেষ হয়নি। জনগণ যেটার মধ্যে হাত দেয় সেটাই দেখে তাদের হাতে নেই। এক মুঠো খাবে— সেই গ্রাসে পর্য্যন্ত হাত পড়েছে। বাচ্চা দুধ খাবে— সেই স্তনেই মনে হয় ট্যাক্স দিতে হবে, প্রকারান্তরে দিতেও হচ্ছে। বাচ্চা স্তন্য পান করতে যাবে—সেখানেও মনে হয় আর কদ্দিন পরে ট্যাক্স বসান হবে। এরা চায় কি? কেউ যাতে শিক্ষায় দীক্ষায়, কোন দিকে না দাঁড়াতে পারে তাই চায়—সবাইকে পঙ্গু করে রাখতে চায়, আরো চায় সবাই বর্বর বনুক—যেটা হিংস্রতার আর একটা রূপ,-তবেই তাদের সুবিধে হয়। দেশে কোটি কোটি লোক রয়েছে—কোন্ জায়গায় না আছে অসুবিধা? হাসপাতালে যাও—সিট একশ, প্রার্থী এক হাজার। কর্মখালি— নেবে পঞ্চাশজন, প্রার্থী পঞ্চাশ হাজার স্কুলে নেবে দেড়শ, দরখাস্ত দেড় হাজার— সর্বত্রই এরকম অসুবিধের মধ্য দিয়ে আমরা দিনযাপন করছি। এরাই রক্ষা করছে—এরাই শাসন করছে, এরাই আবার সবকিছু আত্মসাৎ করছে। নিজেদের এই গ্রাস করার চিন্তায় জাতির সর্বনাশ করতেও একটু দ্বিধা করছে না। তাদের কান্না, "আমার সখের পাঁঠাটি হারিয়ে গেছে!" দুঃখ দেখে মনে হয় অত্যন্ত শোকাতুর—তাদেরই গর্ভজাত সন্তান যেন হারিয়ে গেছে। পরে দেখা গেল মসল্লা পেষা হয়ে গেছে, 'দা'টা আনতে গিয়েছিল মাত্র, এসে দেখে নাই। কান্না দেখে হঠাৎ বুঝা যাচ্ছিল না। দেশের জন্য তাদের কান্না ও চীৎকারও তদনুরূপ। মনে হয় দেশের জন্য যেন তারা নিজেকে উৎসর্গ করেছে— আদতে শিকার খুঁজছে। এই চীৎকার ও মায়া-কান্নার সুযোগে জাতিকে বিভ্রান্ত করে তারা জাতির মৃত্যু-ফাঁদ তৈরী করছে। এটা হিংস্রবৃত্তিরই একটা বিচিত্র পরিচয় ও প্রকাশ। পোষা হাতি অনেক জংলী হাতিকে শুঁড় বুলিয়ে, আদর করে ফাঁদে নিয়ে আসে। এইভাবে বহু স্বাধীন ও মুক্ত হাতিকে ফাঁদে এনে ফেলে।

আমাদের স্বাধীন, সুন্দর ও বলিষ্ঠ মনকে দানবের মায়া-কান্নায় ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলে পিষে মারছে। আমরা মুখ তুলে দাঁড়াতে পারছি না। এদেশেই অনাহারে ফুটপাতে বহুলোক মরে গেছে, তবু পাশে খাবারের দোকানে গিয়ে হামলা করেনি। অতিবড় সৎ ও সাধু মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিল বলেই তারা হামলা না করে ফুটপাতের মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছে। আর ঐ হিংস্ররা সুযোগ নিল সেই সৎ সাধু মনের। এই মনের সুযোগই একদিন নিয়েছিল বৃটিশরা এবং দুশো বছর অবাধে রাজত্ব করে গেছে। কারণ আমাদের sentiment (ভাবপ্রবণতা) তারা ভালভাবেই বুঝেছিল। এখন যারা শাসনকর্ত্তা, তারাও এই Sentiment (ভাবপ্রবণতা) এর সুযোগ নিয়ে আমাদের উপর অত্যাচারের রোলার চালিয়ে পিষে মারবার চেষ্টা করছে। শাসন যারা করছে, পালন যারা করছে তারাই যদি সব জায়গায় ভাগ বসিয়ে যায়, তবে আর থাকবে কি? সেই রাজত্বে বাস করা আর বাঘের খোঁয়াড়ে বাস করা একই কথা। নিয়ম মত সেই রাজত্ব ত্যাগ করা অবশ্যই উচিত, তবু উপায় নেই। ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, 'র‍্যাশনের' থলি নিয়ে যেমন দৌড়াতে হয়, তেমনি সবটাই মেনে নিতে হচ্ছে। এক মিরজাফরের দৃষ্টান্ত এখনও চলছে। কিন্তু এরকম মিরজাফর অজস্র আসছে। জাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াটা কি তার চেয়ে কম? জাতির পতনের মূলে এরাই। তিলে তিলে জাতিকে ও দেশকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মিরজাফর সবটা একবারেই তুলে দিয়েছিল,আর এরা তিলে তিলে মারছে। এদের কোন ক্ষমা নেই। এদের দেশদ্রোহী বললে দেশদ্রোহীকেই অপমান করা হয়—এরা তার চেয়ে অধম। এরা দেশ-কলঙ্ক, নর-কলঙ্ক—এরা কসাই। অপরাধ যে করে সে তো অপরাধীই, আর অপরাধ যে সহ্য করে সেও কম নয়। এই অপরাধীদের সহ্য করে আমরাও অপরাধী হয়ে পড়েছি। নিজেরা তো মরতে চলেছিই, আর যারা মরছে আমাদের সম্মুখে, সেই মৃত্যুর, সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আমরাতো কিছু করছি না! তাদের দুর্ব্যবহারও অন্যায় আচরণের ফলে আমাদেরই দুর্গতি, কিন্তু এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তো কিছু করছি না। এটা তো সবচেয়ে বেশী অপরাধ। প্রকৃতিপ্রদত্ত রক্ষাযন্ত্র যখন আছে— তার সদ্ব্যবহার করাই প্রকৃতির নির্দেশ। সেই আদেশ আমরা পালন করছি কোথায়? আমরা আক্রমণ করতে যাচ্ছি না, কিন্তু আক্রমণকারীকে দমন করতে কোন বাধা নেই। তবে কেন আমরা সেই কর্তব্য থেকে বিরত রয়েছি? জগতে দল যখন সকল জাতির মধ্যেই আছে—আমাদের বেলায় আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা ও প্রতিকারের জন্য সংগঠন করায় বাধা আসবে কেন? আর আসলেও তাকে মানব কেন? আমাদের সংগঠনের বাধাগুলো কোথায়? প্রলোভন ও ব্যক্তিগত স্বার্থই এই গঠনের পক্ষে অন্তরায়। অঙ্গের যে অংশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা তাকে বর্জন করাই শ্রেয়। সংগঠনের সেই দূষিত অংশগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়াই বিধি। আর দূষিত আবহাওয়ায় আমরা আক্রান্ত না হই, তার প্রতিবিধান দরকার। উপযুক্ততা ও বিশেষত্ব আসনে নিয়োগ করা হবে। সেটারই দেখছি এখানে বড় অভাব। মানুষের অভাব অভিযোগ ও খাওয়া পরার সুযোগ নিয়ে যারা কাজ হাসিল করে, তাদের মত খুনী আর কেউ নয়। সেই খুনীদের এখন কি করা উচিত—কোটি -কোটি দেশবাসীর হাতেই সে বিচারের ভার রইল। অনেক প্রাণীকে যেমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, আমাদের দেশ ও জাতিকে সেই ভাবেই হত্যা করা হচ্ছে। এখনও সময় আছে এদের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করার। বিলম্বে আর উপায় থাকবে না। আমরা সবাই মিলে এই শপথ চাই, যেন দেশকে আমরা সর্বনাশের হাত থেকে উদ্ধার করতে শুরু করে দি। কদ্দিন লাগে এদের সংশোধন ও শায়েস্তা করতে! এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বড় বড় 'বাত' বাদ দিয়ে, সময় নষ্ট না করে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করে আমাদের অগ্রসর হতে আর বিলম্ব করা চলবে না এবং চলা উচিতও নয়। ভারত শুধু ব্যাধিগ্রস্ত নয়, সমগ্র পৃথিবী আজ রোগাক্রান্ত। যে সংগঠনের কথা বলছি, সেই সংগঠন শুধু ভারতের ভূমিতেই আবদ্ধ থাকবে না— সমস্ত পৃথিবীর বুকে এই সংগঠনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে এবং সবাই এই সংগঠনে এসে সহযোগিতা করবে, এই বিশ্বাস রাখি— কারণ এই সংগঠনের ভিত্তি অতি পাকা ভিত্তি। সবাই এই ভিত্তির মূলে এসে পড়বে। এখানে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করেই চলতে হবে। পিছপা হলে চলবে না— মাটির দাবী সবারই আছে। তাই সে ভাবেই আমাদের সকলের ভাবতে শেখা উচিত; আঘাতের বন্টন থেকে যখন বাদ পড়ছি না, তবে কেন এখন আমরা ভাবব না? আমাদের এখন সেই ভাবেই তৈরী হতে হবে।